কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৪

সূরা আলাক্ব

আল আলাক্ব কুরআনের ৯৬ তম সূরা। সূরা আলাক্বের আয়াত সংখ্যা ১৯। এতে একটি রূকু রয়েছে। সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। আলাক্ব অর্থ জমাটবাঁধা রক্ত।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ । প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত আর দ্বিতীয় অংশটি ৬ষ্ঠ থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ ,বুখারী ,মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য । এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা) ,আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে ,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু

সূরাটিতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক- মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা (১-২ *আয়াত*)। দুই- পড়া ও লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন কৌশল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের উপর আল্লাহ যে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার বর্ণনা (*৩-৫ আয়াত*)। তিন- অগণিত নে'মত পেয়েও মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করে, যার পরিণতি হয় জাহান্নাম (*৬-১৮ আয়াত*)। চার- পাপীদের আনুগত্য না করে আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(১৯ আয়াত)*।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের ৯৫ নং সূরা আত ত্বীন এ আল্লাহর নবীদের বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১-৩) আর ৯৬ নং সূরা আল আলাক্ব এ আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৩)। সূরা আত ত্বীন এ মানুষকে উত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বর্নিত হয়েছে (আয়াত ৪), সূরা আল আলাক্ব এ মানুষ যে উত্তম তাঁর নমুনা (শিক্ষাগ্রহন) বর্ননা করা হয়েছে (আয়াত ৪-৫)। ত্বীন এ মানুষকে নিচু থেকে নিচু স্তরে নামিয়ে দেওয়ার

বিষয়টি এসেছে আয়াত ৫ এ অন্যদিকে আলাক্ব এ নিচু থেকে নিচু স্তরে নেমে যাওয়ার কারন বর্নিত হয়েছে আয়াত ৬-১৪ তে। প্রথমে (আত্মিক) ঈমান ও পরে (দৈহিক) কাজ এর কথা এসেছে (আয়াত ৬) ত্বীন এ যার বিপরীতে প্রথমে (দৈহিক) কাজ ও পরে (আত্মিক) ঈমান এর কথা এসেছে আলাক্ব এ আয়াত ১৯ তে।

এই সূরা আল আলাক্ব এ আল্লাহর ওহি কিভাবে এসেছিলো তার বর্ননা আছে। পরের (৯৭ নং) সূরা আল ক্বদর এ ওহি কখন নাযিল হয়েছে তার বর্ননা এসেছে। সূরা আল আলাক্ব এবং সূরা আল ক্বদর; উভয়ই আল কুরআনের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে। ৯৬ নং সূরায় পড়তে বলা হয়েছে, আর ৯৭ নং সূরায় কি পড়তে হবে তা বলা হয়েছে।

তাফসীর

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

১. পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন

এটাই সর্বপ্রথম অহী যা নবী (সাঃ)-এর উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হিরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। ফিরিশতা (জিবরীল) তাঁর নিকট এসে বললেন, ‘পড়।’ তিনি বললেন, ‘আমি তো পড়তে জানি না।’ ফিরিশতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চেপে ধরলেন এবং বললেন, ‘পড়।’ তিনি পুনর্বার একই উত্তর দিলেন। এইভাবে ফিরিশতা তিনবার করলেন।

اِقْرَأْঅর্থাৎ, যা আপনার প্রতি অহী করা হয়েছে তা পড়।

বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নে‘মতটির অবতরণের সূচনা করা হ’ল তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্র নামে। এতে একথাও বুঝানো হ’ল যে, যে কোন শুভ কাজের সূচনা আল্লাহর নামে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করতে হবে। অত্র আয়াতে আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের মধ্য থেকে প্রধান দু’টি ছিফাত উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে সবাই মানে। যেমন তিনি বলে- ‘আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তুমি বল সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু ওদের অধিকাংশ কোন জ্ঞান রাখে না’ (*লোকমান ৩১/২৫*)। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে মানলেও পালনকর্তা বা ‘রব’ হিসাবে মানতে অনেকে অস্বীকার করে। যেমন ফেরাঊন প্রকাশ্যে নিজেকে ‘বড় রব’ বলে দাবী করে বলেছিল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ‘আমি তোমাদের বড় পালনকর্তা (*নাযে‘আত ৭৯/২৪*)। সম্ভবতঃ সেকারণেই আল্লাহ প্রথমে ‘রব’ এবং পরে ‘খালেক’ ছিফাতটি এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত ‘রব’ একমাত্র আমিই। আমিই তোমাদেরকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, খাদ্য-শস্য দিয়ে, রোগে আরোগ্য দান করে, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ার এ মুসাফিরখানায় লালন-

পালন করে থাকি। আমার এ পালনকার্যে আমি একক। আমার কোন শরীক নেই। রুবূবিয়াতের সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র আমারই হাতে।

এই আয়াতে শুধু বলা হয়েছে , "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা , যিনি সমগ্র বিশ্ব - জাহান এবং বিশ্ব - জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে।

কুরআনে কোথাও মানুষকে 'শুকনো ঠনঠনে মাটি' থেকে *(রহমান ৫৫/১৪)*, কোথাও 'মাটির নির্যাস' থেকে *(মুমিনূন ২৩/১২)*, কোথাও 'পানি' থেকে *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*সৃষ্টি বলা হয়েছে। এর দ্বারা সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বুঝানো হয়েছে। তবে মানব সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল 'মাটি' *(সাজদাহ ৩২/৭)*। তারপর তাতে পানি ঢেলে চটকানো কাদা *(হিজর ১৫/২৬)*বানানো হয়েছে। কিছুদিন পর ঠনঠনে শুকনো মাটি *(রহমান ৫৫/১৪)*হয়েছে। অতঃপর অবয়ব সৃষ্টি করে তাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করা হয়েছে *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করে উভয়ের মিলনে মানব বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমাদের নানা পর্যায়ে সৃষ্টি করেছি' *(নূহ ৭১/১৪)*।

তিনি বলেন, 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং মায়ের গর্ভে মানব সৃষ্টির একটি স্তর বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যা সকলের বোধগম্য বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু কাছ থেকে আসত, তাহ'লে এতে তারা অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*।

এখানে মানুষকে খাছ করার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির মধ্যে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেরা সৃষ্টি হ'লেও তুমি একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিকৃষ্ট 'জমাট রক্তপিন্ড' হ'তে। 'জমাট রক্তপিন্ড' হ'ল মধ্যবর্তী অবস্থা। এর পূর্বে সে ছিল সূক্ষ্ম একটি পানি বিন্দু। পিতার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু যদি আল্লাহর হুকুমে মিলিত হয়, তবেই সেটা পরে রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়। অতঃপর চার মাস বয়সে সন্তানের রূপ ধারণ করে এবং আল্লাহর হুকুমে তাতে রূহ আগমন করে। এখানে 'জমাট রক্ত' বলে সৃষ্টির পূর্বাপর অবস্থা সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যাবলী উপস্থাপন করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মিলিত ব্যাখ্যায় একথা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক

জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

৩. পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত

এখানে পড়ার আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ। অতঃপর মহান রব আল্লাহর সাথে الْأَكْرَمُ বিশেষণ যোগ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাদান করার নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন

অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীণতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টি সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি , কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার , উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনায় সাহায্যে মানুষকে কসম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

বিদ্বানগণ বলেন, কলম তিন প্রকার : এক- সর্বপ্রথম সেই কলম যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেন এবং লেখার নির্দেশ দেন। দুই- ফেরেশতাদের কলম, যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন বান্দার আমলনামা ও সবকিছুর তাক্বদীর লেখার জন্য। তিন- মানুষের ব্যবহৃত কলম। যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের জন্য ও অন্যান্য কাজের জন্য।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।" [বুখারী: ৩১৯৪, ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে।

এতে বুঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র কলমের সাহায্যেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। কলম আল্লাহ পাকের দেয়া এক অপূর্ব নে'মত। যা মানুষের মনের কথা অবলীলাক্রমে লিখে ফেলে। মনের সাথে কলমের এই সংযোগ, মনের কথা কলমে প্রকাশের ক্ষমতা, আল্লাহর দেয়া এমন এক অমূল্য নে'মত, যার কোন তুলনা নেই, যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। যদি কলম না থাকতো, তাহ'লে দ্বীন-ধর্ম, সমাজ-রাষ্ট্র, আইন-আদালত, সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য কোন কিছুই ধরে রাখা সম্ভব হতো না। সবই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেত। কলম হ'ল মনের ও যবানের প্রতিনিধি। আল্লাহর হুকুমে মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, সেটাই মুখের ভাষায় বর্ণিত হয় ও কলমে লিখিত হয়।

আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ- 'রহমান! যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' (*রহমান ৫৫/১-৪*)। অর্থাৎ আল্লাহর রহমানিয়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হ'ল মানুষকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া। যা তিনি অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। কলম উক্ত ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করে। নুযূলে অহি-র শুরুতেই আল্লাহ এভাবে কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। কলমের সাহায্যে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞাতটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে , তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদদাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে।

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ

৬. বাস্তবেই, মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে,

كَلَّا বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, حقا বা বাস্তবেই, অবশ্যই হয় এমন।

অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

৭) কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।

দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে। এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালজম্বন করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার আবু জাহল বলল, যদি মুহাম্মদকে কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখি তবে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতে আসলে আবু জাহল তাকে বলল, তোমাকে কি আমি সালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? তোমাকে কি আমি এটা থেকে নিষেধ করিনি? রাসূল তার কাছ থেকে ফিরে আসলেন, আবু জাহলের সাথে তার বিতণ্ডা হলো, তখন আবু জাহল বলল, আমার চেয়ে বড় সভাসদের অধিকারী কি কেউ আছে? তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন যে, "সে যেন তার সভাসদদের ডাকে, আমরাও অচিরেই যাবানিয়াদের ডাকব"। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি সে তার সভাসদদের ডাকত। তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর যাবানিয়া পাকড়াও করত। [বুখারী: ৪৯৫৮, তিরমিযী: ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৬, ৩২৯, ৩৬৮]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ ঘসে? তাকে বলা হল যে, হ্যাঁ, তখন সে বলল, লাত ও উযযার শপথ! যদি আমি তাকে তা করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পা দিয়ে দাবিয়ে দিব, অথবা তার মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তার ধারণা অনুসারে সে তার মাথা গুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছে যাওয়ার পর সে পিছনের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হলো এবং হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমার ও তার মাঝে আগুনের একটি খন্দক দেখতে পেলাম এবং ভীতিপ্রদ ও ডানবিশিষ্টদের দেখতে পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে নিকটবর্তী হতো। তবে ফেরেশতাগণ তাকে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলত। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, "কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করে থাকে, যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়..." [মুসলিম: ২৭৯৭]

আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে না করে, ততদিন সে সীমালঙ্ঘন করে না। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অথচ, আল্লাহ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে, তাকে তার মায়ের গর্ভে যত্নে রেখেছেন, বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-পদ্ধতির ব্যবস্থা করে দেন; তারপরেও যখনই সে নিজেকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শুরু করে, তখনই সে এমনকি তার রবের সাথেও সীমালঙ্ঘন করে।

৮. নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে যাওয়া।

দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে । তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ

৯) তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

১০. এক বান্দাকে—যখন তিনি সালাত আদায় করেন।

বান্দা বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" [সূরা আল-ইসরা: ১]। আরও এসেছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" [সূরা আল-কাহফ: ১] আরও বলা হয়েছে, "আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" [সূরা আল-জিন্ন: ১৯]

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ

১১. তুমি কি মনে কর, যদি সে সৎপথে থাকে।

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ

১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?

أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

১৩. আমাকে বল! যদি সে (নিষেধকারী) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন?!

বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কর্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে ? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধা প্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার তকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো। যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরো করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন । তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

১৫. কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে

নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও দুশমনী করা হতে এবং তাঁকে নামায পড়া থেকে বাধা দেওয়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালে উপরিভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টান দেব। হাদীসে বর্ণিত যে, একদা আবু জাহল বলেছিল যে, 'যদি মুহাম্মাদ কা'বার নিকট নামায পড়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার গর্দানে পা রেখে দেব।' অর্থাৎ, তাকে পদদলিত করব এবং দস্তরমত লাঞ্ছিত করব। নবী (সাঃ) এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, "যদি সে তা করত, তাহলে ফিরিশতা তাকে ধরে ফেলতেন।"

কপালের চুল ধরে হেঁচড়ানোর কথা বলেছেন আল্লাহ। কপালের নিচেই থাকে মাথার খুলি; আর তাঁর নিচেই মানুষের ব্রেইন। ব্রেইনের সামনের অংশকে Frontal Lobe বলা হয়। ব্রেইনের এই অংশ মূলত চলাচল, নড়াচড়া, সত্য মিথ্যার বিচার, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি কিছু বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নির্দিষ্ট অংশই কথা যেহেতু চলাচল, নড়াচড়া (দৈহিক বিরুদ্ধাচরন এর কাজ) এবং মিথ্যা বলা, পাপ কাজ এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন (মানসিক বিরুদ্ধাচরন) এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই মাথার বা ব্রেইনের অন্য অংশের কথা না বলে এই অংশের কথাই আল্লাহ বলেছেন এবং এই অংশকেই হেঁচড়ানোর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছেন। আল কুরআন নাযিলের সময় এই বিষয়টি বোঝা না গেলেও বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কত সুন্দরভাবে তা বোঝা যাচ্ছে! কি নিখুত আল্লাহর শব্দচয়ন!

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ।

এটি 'বদল' হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য হ'তে। অর্থাৎ 'আবু জাহলের মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ, যে তার কথায় মিথ্যুক ও কাজে পাপিষ্ঠ'।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

১৭. অতএব সে তার পারিষদকে ডেকে আনুক!

এখানে ل এসেছে التحدّى (চ্যালেঞ্জ)-এর জন্য। অর্থ 'যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহ'লে তার দলবল ডাকুক'।

একদিন রাসূল (ছাঃ) কা'বা চত্বরে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল সেখানে গিয়ে তিনবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا ؟ 'আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি'? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দিলেন। তখন আবু জাহল বলল, أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِى نَادِياً 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছো? অথচ আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার মজলিস অর্থাৎ আমার দলই সবচেয়ে বড়'। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। অতএব দলগর্বী যালেমরা সাবধান!

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

১৮. শীঘ্রই আমরা ডেকে আনব যাবানিয়াদেরকে।

হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী (সাঃ) কা'বাগৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে নামায পড়া হতে নিষেধ করিনি?' অনুরূপ সে আরো তাঁর সাথে কঠিনভাবে ধমক দিয়ে কথা বলল। নবী (সাঃ) তার কথার কড়া জওয়াব দিলেন। তখন সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় সব থেকে আমার পারিষদ ও পৃষ্ঠপোষক বেশী আছে।' তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি আবু জাহল নিজের পারিষদবর্গকে আহবান করত, তাহলে তাদেরকে তখনই শাস্তিদাতা ফিরিশতাগণ পাকড়াও করতেন। (তিরমিযী, তাফসীর সূরা ইকরা পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ১/৩২৯ ও তাফসীর ইবনে জারীর)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এইভাবে রয়েছে যে, সে অগ্রসর হয়ে তাঁর গর্দানে পা রাখার মনস্থ করেছিল। ইতি অবসরে সে উল্টা পা ফিরে গেল এবং নিজ হাত দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে লাগল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ব্যাপার? সে বলল, 'আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের পরিখা, ভয়ংকর দৃশ্য এবং বহু পাখা দেখলাম!' রসূল (সাঃ) বললেন, "যদি সে আমার নিকটবর্তী হত, তাহলে ফিরিশতাগণ তার এক একটা অঙ্গকে নুচে নিত।"

الزَّبَانِيَةَশব্দের অর্থ হল দারোগা এবং পুলিশ (বা প্রহরী)। অর্থাৎ, এমন শক্তিশালী সৈন্য যার কেউ মুকাবিলা করতে পারে না।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب

১৯. কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজদা করুন এবং নিকটবর্তী হোন।

এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও সালাতে মশগুল থাকুন। সিজদা করা মানে সালাত আদায় করা। অর্থাৎ হে নবী! আপনি নির্ভয়ে আগের মতো সালাত আদায় করতে থাকুন। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোআ কর।" [মুসলিম: ৪৮২, আবু দাউদ: ৮৭৫, নাসায়ী: ২/২২৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৭০]

তাফসীর সমাপ্ত

ফুটনোট

- এই সূরার প্রথম ৫টি আয়াত সর্বপ্রথম ওহী হিসাবে নাযিল হয়েছে।
- আল্লাহর বানীর ১ম নির্দেশই ছিলোঃ "পড়ো"। কিন্তু তখন মুহাম্মাদ (স) সহ বেশিরভাগ মানুষই পড়তে জানতো না। এমন একটি অশিক্ষিত জাতির কাছে পড়ার এই আহবান সত্যিই তাৎপর্যপূর্ন। সেই পড়ার নির্দেশের বাস্তবায়নের কারনে সেই মুসলিমরাই এক সময় হয়ে ওঠে সবচাইতে শিক্ষিত জাতি।
- আল্লাহ মানুষকে শেখার ও লেখার জ্ঞান দিয়েছেন। এটি অনেক বড় একটা দান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী; তিনি যেহেতু তাঁর কিছু জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন তাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে সেরা হয়েছে। লিখিত বিদ্যা যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকে, আর মানুষ পড়ার মাধ্যমে তা জানতে পারে। এভাবে লেখা (অন্যরাও উপকৃত হওয়ার মাধ্যম) ও ১ম আয়াতে বর্নিত পড়া (নিজে উপকৃত হওয়ার মাধ্যম) এই দুয়ের সমন্বয় এর মাধ্যমে জ্ঞান টিকে থাকে।
- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরন কারীর সমর্থক, সঙ্গী সাথীদের বিপরীতে আল্লাহর বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। তাঁর এই অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বেপরোয়া ভাবের পিছনে শক্তি হিসাবে কাজ করছিল তাঁর গোত্র, বড় বড় নেতাদের সমর্থন। কিন্তু এখানে আল্লাহ ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে তাঁর/তাদের যাকে ইচ্ছা হয় ডেকে নিক কিন্তু আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতাদের মোকাবেলায় তারা অতি তুচ্ছ, নগন্য বিবেচিত হবে।
- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরন না করে বরং তার অনুগত, নিকটবর্তী বান্দা হওয়ার জন্য সিজদা করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি হয়েছে।